জীবন-জীবিকায়নে

ক্ষুদ্রঋণ

DFED
Foundation for Economic Development
DAM

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট

জীবন-জীবিকায়নে

ক্ষুদ্রঋণ

DFED
Foundation for Economic Development
DAM

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট

প্রকাশকাল
জুন ২০১৯

প্রকাশনায়
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)
বাড়ি নং- ৮৫২, রোড নং- ১৩, আদাবর
বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, ঢাকা-১২০৭

উপদেষ্টা
ড. এম. এহ্ছানুর রহমান

সম্পাদক
মো. আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক
মো. রেজাউল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মো. আমিনুল হক

মুদ্রণ
আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪, আশুলিয়া মডেল টাউন
খাগান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

ISBN 000-000-00000-3-6

পাঠকের জন্য দ্রষ্টব্য

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সময়ের পরিক্রমায় মিশনের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম একটি টেকসই ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে জুন ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। তাই ডিএফইডি কর্তৃক প্রকাশিত জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ সংকলনে উল্লেখিত কেস স্টাডিসমূহ মিশনের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে।

সূচিপত্র

রঙিন মাছের চাষ
আরিফুর রহমান, স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ

পৃষ্ঠা ▶ ০৭

তাঁত কারিগর মমতাজের সাফল্য
ইয়াসমিন পিউ, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ▶ ০৯

কলাচাষি পেয়ারা বেগমের দিনবদলের গল্প
ইয়াসমিন পিউ, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ▶ ১১

টমেটোতে হালিমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন
নিজস্ব প্রতিবেদক, আলোকিত বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা ▶ ১৩

সুপারি কুচি করে লাখপতি কেশবপুরের পার্বতী
শফিকুল ইসলাম, স্টাফ রিপোর্টার, নয়া দিগন্ত

পৃষ্ঠা ▶ ১৫

বেকারিতে ভাগ্য পরিবর্তন খাদিজার
হাসান সোহেল, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ▶ ১৭

কাঠের শোপিস তৈরি করে শাহানা এখন স্বাবলম্বী
শফিকুল ইসলাম, স্টাফ রিপোর্টার, নয়া দিগন্ত

পৃষ্ঠা ▶ ১৯

সালেহার স্বাচ্ছন্দ্যের সংসারের বাহক মুরগীর খামার
নিজস্ব প্রতিবেদক, The Bangladesh Today

পৃষ্ঠা ▶ ২১

সাফল্যের নজির গড়লেন বরগুনার নূপুর
হাসান সোহেল, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ▶ ২৩

শুঁটকিতে মজিদার সাফল্য
নিজস্ব প্রতিবেদক, আলোকিত বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা ▶ ২৫

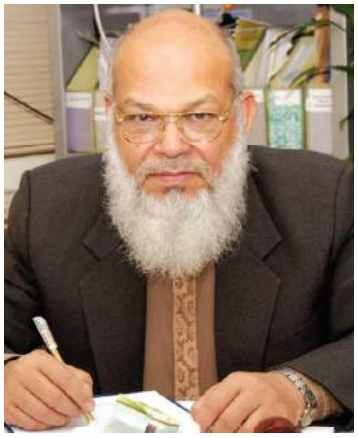

শুভেচ্ছা বাণী

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নানান উদ্ভাবনীমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাফল্য নিয়ে 'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' সংকলনটির ৩য় সংখ্যা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বকর্মসংস্থান ও মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। টেকসই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ যাতে স্থায়ীভাবে বের হয়ে আসতে পারে সেই লক্ষ্যে ডিএফইডি দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। এ ছাড়াও ভোক্তাদের অধিকার, পণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ছোট ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে উৎপাদনশীলতা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে থাকে।

এই প্রকাশনাটিতে ডিএফইডি-এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাফল্যগাঁথা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকাশনাটি ডিএফইডি-এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। 'জীবন-জীবিকায়নে ক্ষুদ্রঋণ' শীর্ষক প্রকাশনাটি আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত করবে বলে আমি আশা করি।

এ প্রকাশনাটিকে তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করার জন্য ডিএফইডি-এর যে সকল কর্মকর্তা কাজ করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কাজী রফিকুল আলম
চেয়ারপার্সন

মুখবন্ধ

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য "ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)" নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে জুন ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। জীবন-জীবিকা উন্নয়নের জন্য ডিএফইডি সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে কৃষি বহুমুখীকরণ, উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মার্কেট লিংকেজ, বাজার চাহিদা সংশ্লিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির ওপর জোর প্রদান করে। এ ছাড়াও উৎপাদনমুখী স্বকর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে ডিএফইডি'র মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি গত দুই দশক ধরে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে একটি দরিদ্র পরিবার কীভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে তার চিত্র প্রায়শই গণমাধ্যমগুলোতে সঠিকভাবে ওঠে আসে না। তাই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি কীভাবে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখছে তা বৃহৎ পরিসরে তুলে ধরার জন্য ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ২০১৬ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জনসংযোগ বিভাগের সহায়তায় দেশের শীর্ষ স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর সমন্বয়ে একটি মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। উক্ত মিডিয়া ক্যাম্পেইনের আওতায় বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীরা ডিএফইডি'র ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে ফিচার প্রতিবেদন তৈরি করে যা উল্লেখিত সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উক্ত মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রকাশিত ফিচার প্রতিবেদনগুলোয় ডিএফইডি'র উৎপাদনমূখী কৃষিভিত্তিক সৃজনশীল কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগসমূহে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সফলতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত ফিচারসমূহে বেকার তরুণ ও যুব সমাজের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত ফিচার প্রতিবেদনগুলো আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত করবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ফিচার প্রতিবেদনগুলোকে একত্রিত করে এই সংকলনটি প্রকাশ করা হয়েছে। সংকলনটি প্রকাশের জন্য যে সকল গণমাধ্যমকর্মী ডিএফইডি'র মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কাহিনীসমূহ সংগ্রহ ও জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছেন এবং ডিএফইডি-এর যে সকল কর্মকর্তা সংকলনটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. এম. এহ্ছানুর রহমান
সেক্রেটারী জেনারেল

পাঠকের জন্য দ্রষ্টব্য

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত একটি ফিন্যান্সিয়াল ইনষ্টিটিউট। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সময়ের পরিক্রমায় মিশনের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম একটি টেকসই ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে যা মিশনের একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে অক্টোবর ২০১৩ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। ডিএফইডি প্রান্তিক চাষী ও অতিদরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম, অনগ্রসর দূরবর্তী স্থানে রেমিটেন্স সেবা চালু, গ্রাহকদের জন্য অটোমেটেড সার্ভিস প্রদান করে।

ডিএফইডি বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচনে নারী ক্ষমতায়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কর্মসূচি ১৬টি জেলার ৫৮টি উপজেলার ২৪৭টি ইউনিয়নের ১২০৪টি গ্রামে ৫৬৭৯টি দলের ১০৯,৫৮১ জন সদস্যকে ৮২টি ব্রাঞ্চ এবং ১৭টি এরিয়া অফিসের মাধ্যমে পরিচালনা করছে।

পাঠকের জন্য দ্রষ্টব্য

রঙিন মাছের চাষ

প্রকাশকাল: ১০ মে, ২০১৬, কালের কণ্ঠ

আরিফুর রহমান; স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা থেকে ফিরে

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার বজ্রবক্স গ্রামের সাইফুল্লাহ গাজী ও জেসমিন সুলতানা দম্পতির এক যুগ আগেও ছিল টানাটানির সংসার। স্বামী সাইফুল্লাহ গাজী ঢাকার মিরপুরে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকুরি করে মাসে যে টাকা বেতন পেতেন, বাসা ভাড়া দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা দিয়ে আর সংসার চলত না। প্রতিদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হতো দম্পতির। একটু স্বচ্ছলতার আশায় তারা দুইজনই সিদ্ধান্ত নিলেন শহরে আর থাকবেন

সাইফুল্লাহ গাজী তার কর্মীদের সাথে রঙিন মাছের গ্রেডিং-এ ব্যস্ত

না, গ্রামে গিয়ে মাছ চাষ করবেন। তামিম নামে এক বন্ধু রঙিন মাছের চাষ করার সুবাদে তার কাছ থেকে ছয় জোড়া ব্রুড মাছ (অ্যাকুরিয়ামের জন্য রঙিন মাছ বিশেষ) সংগ্রহ করে ২০০৪ সালে গ্রামে গিয়ে রঙিন মাছ চাষ শুরু করেন সাইফুল্লাহ গাজী ও জেসমিন সুলতানা। সেই ছয় জোড়া ব্রুড মাছ এক যুগ পর এখন কয়েক লাখে গিয়ে ঠেকেছে। বর্তমানে তাদের মূলধন ২০ লাখ টাকা। লিজ নেয়া পুকুরের সংখ্যা ২০টি। এসব পুকুরে ২০ থেকে ২৫ জাতের রঙিন মাছের পোনা উৎপাদন হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ২০ জন শ্রমিকের। সাইফুল্লাহ গাজী বলেন, '২০০৪ সালে মাত্র ছয় জোড়া মাছের পোনা দিয়ে এ পেশা শুরু করি। ব্যবসা বাড়াতে তখন হাতে টাকা ছিল না। তখন ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ সম্প্রসারণ করি। আমার এখান থেকে ঢাকার কাঁটাবন, খুলনা, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রঙিন মাছ পাঠানো হয়। এখন আমি একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। দুই সন্তান নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছি'।

রঙিন মাছ চাষ করতে গিয়ে শুরুর দিকে পথ খুব মসৃণ ছিল না সাইফুল্লাহ গাজী ও জেসমিন সুলতানার জন্য। রঙিন মাছ চাষ করতে প্রশিক্ষণ লাগে। অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন হয়। সঙ্গে আর্থিক বিষয় তো থাকেই। এতসব সীমাবদ্ধতাও দমাতে পারেনি তাদেরকে। স্বামী সাইফুল্লাহকে প্রতিনিয়তই উৎসাহ দিয়ে যেতেন জেসমিন সুলতানা। প্রশিক্ষণের জন্য স্বামীকে ভারতে পাঠিয়েছেন। কলকাতা ও মুম্বাইয়ে সাইফুল্লাহ গাজীর প্রশিক্ষণ শেষে স্বামী-স্ত্রী যখন মাছ চাষ শুরু করেন, তখন দিনকে দিন মনে হয়নি; রাতকে রাত। শুরুর দিকের গল্পটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এমনও অনেক দিন কেটে গেছে, দুপুরের

খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে; কিন্তু টের পাওয়া যায়নি। মাত্র তিনটি পানির হাউজ (হ্যাচারি) দিয়ে যাত্রা শুরু। সেখানে মাছের ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা করা হতো। প্রথম প্রথম পোনা মারা যেত। তাতে হতাশ হয়ে পড়তেন সাইফুল্লাহ। কিন্তু সে হতাশাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দিতেন না জেসমিন। স্বামী সাইফুল্লাহকে বলতেন- 'হতাশ হয়ো না; আবার মাছের পোনা নিয়ে আস। আবার শুরু করো। একসময় সফল হবোই'। আস্তে আস্তে সাফল্য ধরা দিতে লাগল। তিনটা হ্যাচারি ছয়টাতে রূপ নিলো। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়াল আর্থিক সংকট। কারণ, হ্যাচারি হলেই তো হবে না, মাছ চাষ করতে তো পুকুর দরকার। কিন্তু পুকুর লিজ নেওয়ার টাকা তো নেই। টাকার জন্য যখন হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন সাইফুল্লাহ গাজী ও জেসমিন; তখন আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ডিএফইডি। সোনাবাড়ীয়া শাখা থেকে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন সাইফুল্লাহ গাজী। ওই ৫০ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে একটি পুকুর ইজারা নিয়ে সেখানে মাছ চাষ শুরু করেন। ২০০৫ থেকে ২০০৯ কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে সাইফুল্লাহর। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। বজ্রবক্স গ্রামে ২০টি পুকুর লিজ নিয়েছেন সাইফুল্লাহ। যেখানে বছরে চার লাখ টাকা পরিশোধ করতে হয়।

রঙিন মাছ দেখতে সুন্দর, অন্য মাছের সঙ্গে তুলনা করলে দামও বেশি। তাছাড়া সাতক্ষীরা জেলার জন্য বিরলও বটে। সাধারণ মানুষের রঙিন মাছের প্রতি আকর্ষণও বেশি। পুরো জেলাতে শুধু সাইফুল্লাহ ও জেসমিন রঙিন মাছের ব্যবসা করেন। পুকুরের পাশ দিয়ে যারা যান, মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাছের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোনো দুর্বৃত্ত পানিতে যাতে বিষ না দেয় কিংবা মাছ চুরি না করে সেজন্য রাখা হয়েছে পাহারাদার। সময় করে পালাক্রমে ১২ জন শ্রমিক পুকুরগুলো পাহারা দেন। তবে এখন পর্যন্ত কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।

সাইফুল্লাহ গাজী ও জেসমিন সুলতানা প্রথম দিকে চার-পাঁচ জাতের মাছ চাষ করলেও এখন ২০ থেকে ২৫ জাতের মাছ চাষ করেন। তার পুকুরে গোল্ডেন গোরামিল, ব্লু গোরামিন, কিচিং গোরামিন, মিল্কি কইকাপ, ব্লাক মোর, কইকাপ, কমিটসহ ২০ থেকে ২৫ প্রজাতির রঙিন মাছ উৎপাদন হয়। প্রতিটি মাছের দাম সর্বনিম্ন দশ টাকা থেকে শুরু করে ১২০ টাকা পর্যন্তও আছে। সিঙ্গাপুর থেকে মিল্কি কইকাপ জাতের একটি মাছ দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনে এনেছেন সাইফুল্লাহ ও জেসমিন। বাংলাদেশে অ্যাকুরিয়ামে রঙিন মাছ পালন ব্যাপক জনপ্রিয়। সৌখিন মানুষ বাসাবাড়িতে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অ্যাকুরিয়াম ব্যবহার করেন। শুধু বাসাবাড়িতেই নয়, শপিং মল, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও দোকানেও অ্যাকুরিয়ামের ব্যবহার বেড়েছে। আগে উচ্চবিত্তরা অ্যাকুরিয়াম ব্যবহার করতো। গত কয়েক বছরে এই ধারা কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তরাও অ্যাকুরিয়ামের জন্য রঙিন মাছ কিনছেন। মূলত সৌখিন মানুষরাই এদিকে ঝুঁকছে। তাছাড়া রঙিন মাছ আগে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রঙিন মাছ দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। এমনকি দিন দিন রঙিন মাছ জনপ্রিয়ও হচ্ছে। ফলে রঙিন মাছের মাঝেই ভবিষ্যত স্বপ্ন দেখেন সাইফুল্লাহ্ ও জেসমিন।

সাইফুল্লাহ গাজী বলেন, পুকুরের পরিবেশ একটু ভালো রাখলে, নিয়মিত চুন ব্যবহার করলে, স্বচ্ছ পানি থাকলে এবং জীবাণুমুক্ত পানি হলে সেখানে রঙিন মাছ উৎপাদন করা যায়। এ ছাড়া বাজারে রঙিন মাছের জন্য আলাদা খাবার আছে। যদিও দাম একটু বেশি, সেসব খাবার মাছের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বাজারে বেশ কিছু ঔষুধও আছে। তিনি বলেন, প্রথম এই ব্যবসা শুরু করার সময় ডিএফইডি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ডিএফইডি থেকে এখন এক লাখ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছি। সরকারের পক্ষ থেকে একটু সহযোগিতা পেলে রঙিন মাছ বিদেশেও রপ্তানি করার সুযোগ আছে। সাইফুল্লাহ ও জেসমিন স্বপ্ন দেখেন, একদিন তিনি তারা এই মাছ সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেবেন। তবে সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সামনে কিছু বাধাও আছে। রঙিন মাছ চাষ করতে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধার প্রয়োজন হয়। সঙ্গে দরকার হয় ফ্রেশ পানি। পাশাপাশি জায়গা। দুই সন্তান নিয়ে সুখী পরিবারটি এখন তাকিয়ে আছে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধার দিকে। এর পাশাপাশি নতুন জায়গা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে তাদের। কারণ, জায়গার অভাবে মাছ উৎপাদন সম্প্রসারণ করতে সমস্যা হচ্ছে। তবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই স্বপ্ন দেখেন, সব বাধা-বিপত্তি ও সমস্যা ডিঙিয়ে একদিন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। আর সেটি হলো দেশের সব জেলায় রঙিন মাছ বাজারজাতকরণ এবং বিদেশে রঙিন মাছের রপ্তানি।

রঙিন মাছ চাষে অনন্য অবদানের জন্য সাইফুল্লাহ গাজী ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত "১৩তম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার" এর 'শ্রেষ্ঠ কৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা' বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে বিরল সম্মান অর্জন করেন। তিনি বলেন, আমাকে আরও অনেক দুর যেতে হবে। দেশব্যাপি ছড়িয়ে দিতে হবে এই প্রযুক্তি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রঙিন মাছ চাষের পেশায়ই থেকে যেতে চান এই সফল উদ্যোক্তা দম্পতি।

তাঁত কারিগর মমতাজের সাফল্য

প্রকাশকাল: ১০ মে, ২০১৬, দৈনিক ইত্তেফাক

ইয়াসমিন পিউ, স্টাফ রিপোর্টার, নরসিংদী থেকে ফিরে

মমতাজ বেগম (৫০)। স্বামী আবু সাঈদ (৫৫)। নরসিংদী সদরের নূরালাপুর গ্রামের বাসিন্দা। দুই মেয়ে সারমিন ও সাহিদার বিয়ে দিয়েছেন ভালো ঘর দেখে। এদের মধ্যে সাহিদাকে কলেজ পর্যন্ত পড়িয়েছেন। ছেলে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে ব্যবসায় সহায়তা করছে। ইতোমধ্যে ছেলে শাহীনের জন্য পাত্রী ঠিক করেছেন খুব শিগগিরই বিয়ে। ৩ তলা ফাউন্ডেশন করে প্রথম তলা ভবনের কাজ শেষ করেছেন। দ্বিতীয় তলার কাজ চলছে। অথচ এক সময়ে সংসারে

স্বপ্রতিষ্ঠিত হস্তচালিত তাঁতকলের গামছা বুনন যাচাই করছেন মমতাজ

অভাব লেগেই থাকতো। ভাগ্য পরিবর্তনে তাই স্বামী-স্ত্রী মিলে হস্তচালিত তাঁতকলের কাজ শুরু করেন। এভাবে ধীরে ধীরে অভাবের সংসারে এসেছে সচ্ছলতা।

১৯৮৩ সাল থেকে তাঁতের কাজ শুরু করেন মমতাজ বেগম। প্রথমে মানুষের কারখানায় স্বামী এবং নিজে কাজ করতেন। পরে ১৯৮৮ সালের দিকে একটি হস্তচালিত তাঁতকল মাঝে মাঝে ভাড়ায় এনে কাজ করতেন। এভাবে আস্তে আস্তে টাকা জমিয়ে একটি তাঁতকল কিনেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভলপমেন্ট (ডিএফইডি) এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হন মমতাজ বেগম। ডিএফইডি থেকে প্রথমে ৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাজ শুরু করেন। প্রথমে ছোট একটি ঘরে একটি মেশিন দিয়ে কাজ করতেন। এভাবে বছর বছর ঋণ বাড়িয়ে তাঁতকলের পরিধি বাড়াতে থাকেন। বর্তমানে তাঁর ২০টি তাঁতের হস্তচালিত মেশিন রয়েছে। মমতাজ বেগমের কারখানায় অধিকাংশই পুরাতন মেশিন। যা ১০ হাজার টাকা করে কিনেছেন। নতুন একটি মেশিন তৈরি করতে প্রায় ২০ হাজার টাকা খরচ পড়ে। অবশ্য নতুন মেশিন পুরাতন মেশিনের মতো টেকসই হবে না বলে

উল্লেখ করেন। তিনি জানান, বেশিরভাগ কারখানাতেই পুরাতন মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মেশিন একজন থেকে অন্যজনে হাতবদল হয়েছে। একেকটি হস্তচালিত তাঁতকল মেশিনের বয়স ১০০ বছরের উপরে। এসব মেশিনের উৎপাদিত গামছা বিক্রি করে প্রতিবছর ৩ লাখ টাকার ওপরে মুনাফা হয়। মমতাজ বেগমের কারখানার উৎপাদিত গামছা যাচ্ছে রংপুর, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুরসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সব মিলিয়ে মমতাজ বেগম আজ জীবন সংগ্রামে জয়ী একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

মমতাজ বেগম জানান, ডাম ফাউন্ডেশন থেকে সর্বশেষ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। অবশ্য গতবছর ডিএফইডি থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার ঋণ নিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রায় ২৫ শতাংশ জমির ওপর তার তাঁতের কারখানা। শাড়ি বা লুঙ্গি নয়; মমতাজ বেগম কারখানায় শুরু থেকেই গামছা তৈরি করছেন। মমতাজ বেগম বলেন, ছোট, মাঝারী ও বড় এই তিন ধরনের গামছা বাড়িতে এসে পাইকাররা নিয়ে যান। অন্যান্য কারখানার চেয়ে তার গামছার কারুকাজ কিছুটা ভিন্ন থাকায় এবং গুরুত্ব সহকারে কাজ করায় তার গামছার চাহিদা বেশি। কারখানায় প্রতিদিন ২০ রংয়ের গামছা উৎপাদিত হয়। এই গামছা থান হিসেবে বিক্রি করেন তিনি। ১ থানে ৪টি গামছা থাকে। প্রতি থান ১৫০ টাকা। মাঝে মাঝে বাজারে গিয়ে স্বামী আবু সাঈদও গামছা বিক্রি করেন। খুচরা বিক্রি করলে ১ থান ১৭০ টাকায় বিক্রি করতে পারেন। অবশ্য খরচও কম নয়; প্রতি পাউন্ড সুতা ১১০ টাকায় ক্রয় করেন। যা দিয়ে ১ থান বা ৪টি গামছা তৈরি হয়। প্রতিদিন কারখানায় ২০০ পাউন্ড সুতার প্রয়োজন হয়। শ্রমিকদেরকে থান প্রতি ৫০ টাকা দেন। একজন শ্রমিক প্রতিদিন ৬ থান গামছা তৈরি করেন। মমতাজ বেগমের কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক আশেপাশের। তবে, নরসিংদীর বাইরের শ্রমিকও কাজ করছে। বসে বসে মনযোগ সহকারে কাজ করতে হয় বলে বয়স্ক শ্রমিকরাই বেশি কারখানাতে কাজ করছেন। আলী মিয়া (৫৫) নামে এক শ্রমিক জানান, গত ১০ বছর থেকে এই কারখানায় কাজ করছি। একই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন টুনু মুন্সী (৭৫)। তিনি বলেন, বয়স হয়েছে জমিতে কাজ করা কঠিন, তাই কারখানার মধ্যে বসে বসে কাজ করছি। মমতাজ বেগম এক সপ্তাহে শুধুমাত্র শ্রমিকদের বেতনই দেন ২৫ হাজার টাকা।

লাভের পাশপাশি মাঝে মাঝে রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্ষতিতেও পড়তে হয় বলে উল্লেখ করেন মমতাজ। তিনি জানান, মাঝে রাজনৈতিক অস্থিরতায় কারখানা অনেকটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। লোকজন কারখানায় কাজ করতে আসতে ভয় পেত। শ্রমিকদের বিভিন্ন ঝামেলায় পড়তে হতো। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় ৬ লাখ টাকার বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি। মমতাজ বেগম তাঁতের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ডিএফইডি থেকে জীবন দক্ষতার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। মমতাজ বেগমের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগে সফলতা দেখে আরো অনেকেই তাঁত ব্যবসা শুরু করেছেন। এই তাঁত ব্যবসায় সফল হতে কীভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে এলাকার অনেককেই পরামর্শ দিচ্ছেন মমতাজ বেগম। এলাকার লোকজনও মমতাজ বেগমের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন।

মমতাজ বেগম জানান, ডিএফইডি থেকে আমরা শুরু থেকেই আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছি। তবে আরও বেশি ঋণ পেলে লাভবান হওয়া যেত। বেশি ঋণ সুবিধা পেলে কীভাবে লাভবান হতেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাঝে মাঝে গামছার বাজার দর কম থাকে। টাকা থাকলে ওই সময়ে তৈরি গামছা কিনে রেখে দেওয়া যেত। পরে বাজার ভালো হলে বিক্রি করার মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো।

ডিএফইডি নরসিংদীর এরিয়া ম্যানেজার মো. তোফাজ্জল হোসেন জানান, মমতাজ বেগম দীর্ঘদিন ধরে ডিএফইডি-এর মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত থেকে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা থেকে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছেন। শুধু ঋণ গ্রহণই নয়; ঋণের বিপরীতে মমতাজ বেগমের সঞ্চয়ও অনেক ভালো। ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রসারে মমতাজ বেগমকে আরো বেশি ঋণ প্রদানের আশ্বাস দেন তোফাজ্জল হোসেন।

কলাচাষি পেয়ারা বেগমের দিনবদলের গল্প

প্রকাশকাল: ১৯ এপ্রিল, ২০১৬, দৈনিক ইত্তেফাক

ইয়াসমিন পিউ, স্টাফ রিপোর্টার, নরসিংদী থেকে ফিরে

'টাকার অভাবে এক সময়ে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতে হয়েছে। তখন জমিতে ধান আর সবজি চাষ করতাম। ফলন ভালো না হওয়ায় লাভ তো দূরের কথা, তিন বেলা খাবারই জুটতো না। সেটা ছিল ২৫ বছর আগের কথা। পরে কলা চাষ শুরু করলাম। লাভ বেশি বলে কলাচাষের দিকেই মনোযোগ দেই। আর কলা চাষেই বদলে যায় আমাদের দিন। কয়েকদিন আগে নরসিংদীর সিলমান্দী গ্রামের কলাচাষি পেয়ারা বেগম (৫০) এভাবেই তার দিন বদলের গল্প বলছিলেন।

হাস্যোজ্জল মুখে কলাবাগানে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনছেন পেয়ারা বেগম

তিনি বলেন, ঝড়-তুফানে ক্ষতি ছাড়া কলা চাষে অর্ধেকেরও বেশি লাভ হয়। প্রায় ২৫ বছর ধরে কলা চাষ করছেন তিনি। বর্তমানে ৫০ শতাংশ জমিতে তার কলার বাগান। স্বামী তারু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে একজন স্বীকৃত কলা ব্যবসায়ী হিসেবে গ্রামে পরিচিত পেয়েছেন পেয়ারা বেগম। ওই গ্রামের শুধু পেয়ারা বেগমই নয়, কলাচাষ করে এখন অনেকের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। আরো অনেকে উৎসাহিত হচ্ছেন কলাচাষে। এলাকাবাসী জানায়, কলাচাষে গ্রামের শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

পেয়ারা বেগমের দুই ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়ে এখন সুখের সংসার। কলাবেচা টাকা দিয়েই বড় ছেলে মাহে আলমকে বিদেশ পাঠিয়েছেন, ছোট ছেলে পড়ছে ৭ম শ্রেণিতে। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, মেজ মেয়ে এবার এসএসসি

পরীক্ষা দিয়েছে এবং ছোট মেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ছে। পেয়ারা বেগমের টিনের বাড়ি এখন তিনতলা বিল্ডিংয়ে পরিণত হচ্ছে।

পেয়ারা বলেন, কলা বাগানে বিভিন্ন ধরনের ওষুধের পাশাপাশি পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কীটনাশকের ব্যবহার করতে হয়। এ জন্য অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। এ ছাড়া প্রতিমাসের ১০/১৫ দিন ৪ জন করে শ্রমিক কলা বাগানে কাজ করে। একেক জন শ্রমিকের মজুরি ৪০০ টাকা।

কলা চাষে সরকারি কর্মকর্তাদের কোনো ধরনের পরামর্শ বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচতে ওষুধের সাহায্য পান কি-না জানতে চাইলে পেয়ারা বেগম বলেন, সাহায্য বলতে 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (ডিএফইডি)-এর মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছি। তবে সরকারের কাছ থেকে কলা চাষে পরামর্শ এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কীটনাশক পেলে কলা চাষে আরো লাভবান হওয়া যেত। একই সঙ্গে কলার মানও ভালো হতো। কৃষকরাও ভালো দাম পেতো। তবে মাঝে মাঝে কলা গাছে পোকা বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে চাষিদের সঙ্গে কথা বলে আমরা নিজেরাই বাজার থেকে কীটনাশক ক্রয় করে বাগানে ব্যবহার করে থাকি। তিনি জানান, অনেক সময় পোকার আক্রমণে কলাগাছ মরে গেলেও কৃষি কর্মকর্তারা আসেন না।

এখন পেয়ারা শুধু কলা নয়, কলার চারাও বিক্রি করেন। কেউ চারা নিয়ে বাগান করেন। কেউ বাড়ির আঙ্গিনায় নিজেদের খাওয়ার জন্য কলার চারা লাগান। একটি কলার চারা ৬ থেকে ১০ টাকায় বিক্রি হয়। অতি সম্প্রতি তিনি ২০০ কলার চারা ১২০০ টাকায় বিক্রি করেছেন। ছোট/বড় চারা আলাদা আলাদা দামে বিক্রি হয়। প্রথম কলা চাষ শুরুর সময় আরেক চাষীর কাছ থেকে চারা কিনেছিলেন। ৬০০ টাকায় ২০টি কলার চারা দিয়ে ওই সময়ে কলাচাষ শুরু করেন তিনি। এই ফসলের আর একটি বড় গুণ হচ্ছে; কলার বীজ একবার কিনলে আর কিনতে হয় না। কলা গাছ থেকেই চারা পাওয়া যায়।

সিলমান্দী গ্রামের বাগানে সাগর কলার চাষই বেশি হয়। তবে, সবরি কলার চাষও করে অনেকে। এখানকার কলা অন্যান্য এলাকার চেয়ে মিষ্টি বেশি বলেই চাহিদাও বেশি। বেশিরভাগ কলাই থোড় আসার পরপরই ক্ষেত হিসেবে বিক্রি করা হয়। পাইকাররা ক্ষেত থেকে কলা নিয়ে যান।

ডিএফইডি নরসিংদীর এরিয়া ম্যানেজার মো. তোফাজ্জল হোসেন জানান, পেয়ারা বেগম ১৯৯৫ সাল থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন। প্রথম তিনি ৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কলা চাষ শুরু করেন। এখন তিনি এলাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কলা ব্যবসায়ী। সর্বশেষ পেয়ারা বেগমকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তোফাজ্জল হোসেন।

টমেটোতে হালিমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন

প্রকাশকাল: ২৭ জুন, ২০১৬, আলোকিত বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, নরসিংদী থেকে ফিরে

সাতক্ষীরার আগরদাড়ি ইউনিয়নের হালিমা খাতুনের বয়স এখন ২২। হালিমা খাতুনের বয়স যখন ১৮, তখন পারিবারিকভাবে তাকে বিয়ে দেওয়া হয় পাশের রামেরভাঙ্গা গ্রামের আবদুস সামাদের (৩২ বছর) সঙ্গে। সাতক্ষীরা শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে রামেরভাঙ্গা গ্রামের আবদুস সামাদের শারীরিক গঠন ভালো; শিক্ষিতও। ডিগ্রি পাশ

টমেটো পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হালিমা খাতুন

করেছেন। শিক্ষিত হওয়ার ফলে চাকুরির জন্য অনেক চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা। কোথাও চাকুরি হচ্ছে না। এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে পড়েন সামাদ। কি করবেন কোনো কিছু কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। বিয়ে করেছেন; বউকে কি খাওয়াবেন, শিক্ষিত অথচ বেকার; সমাজের মানুষ কি ভাববে-এগুলো নিয়ে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন সামাদ। স্বামীর দুশ্চিন্তা ভাবিয়ে তুলে হালিমা খাতুনকে। স্বামীকে উৎসাহ দিতে থাকেন, চাকুরি না করেও গ্রামে আরো অনেক কিছু করে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। স্ত্রী হালিমার কথায় টনক নড়ে সামাদের। চাকুরি না করেও সংসার চালাতে আরো অনেক কিছু করা যায়।

স্বামী-স্ত্রী বসে সিদ্ধান্ত নিলেন টমেটো চাষ করে নিজেদের ভাগ্য বদল করবেন। হালিমার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে পুরনো হতাশা ঝেড়ে ফেলে নতুন উদ্যোমে টমেটো চাষের পরিকল্পনা শুরু করেন সামাদ। কিন্তু ব্যবসা করতে তো প্রথমেই পুঁজি দরকার। তাঁর তো সে পুঁজি তো নেই। হালিমাকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ডাম

ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)। বড় ভাইয়ের কাছ থেকে এক বিঘা জমি লিজ নিয়ে এবং ডিএফইডি থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামী সামাদের সাথে ২০১৩ সাল থেকে শুরু করেন টমেটো চাষ। সেই যে শুরু, এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। এখন আর পরিবারের কাছে হাত পাততে হয় না সামাদের। নিজের উপার্জিত টাকা দিয়েই সুখে শান্তিতে সংসার চলে। ২০১৩ সালে জীবনযুদ্ধে নেমেছিলেন; তিন বছরের ব্যবধানে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে ফেলেছেন। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে হালিমার উৎসাহ এবং শ্রমের বিনিময়ে।

এক বিঘা জমিতে টমেটো চাষে খরচ হয় এক লাখ টাকা। সে টমেটো বাজারে বিক্রি হয় তিন লাখ টাকা। ফলে হালিমা দম্পতির মুনাফা হয় দুই লাখ টাকা। তবে এই মুনাফার পেছনে রয়েছে হালিমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলার শ্রম। কারণ, স্বামীকে নিয়ে সার্বক্ষণিক টমেটোর ক্ষেতে নার্সারি করা থেকে শুরু করে সে টমোটো ঘরে এনে তা বাজারজাতকরণের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা এসব কাজই করতে হয় হালিমাকে। শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন দুই সময়েই টমেটো চাষ করেন হালিমা-সামাদ দম্পতি। তবে শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালের টমেটোর দাম বেশি পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এক কেজি টমেটো বিক্রি করা যায় ৭০ টাকা। অথচ শীতকালে সে টমেটো বিক্রি হয় ১৪ থেকে ২০ টাকায়। তবে দুই সময়েই টমেটো চাষ করতে স্বামী সামাদকে উৎসাহ দেন হালিমা। সে আলোকে দুই সময়েই টমোটো চাষ করে আজ হালিমাদের পরিবারে ফিরে এসেছে স্বচ্ছলতা। তিন বছরের সন্তান শিহাব উদ্দিনকে নিয়ে বেশ সুখে-শান্তিতেই দিন কাটছে হালিমা-সামাদ দম্পতির।

অথচ প্রথম দিকে যখন টমেটোর চাষ শুরু করেন হালিমা-সামাদ, তখন টমেটো চাষের কোনো ধারণাই ছিল না তাঁদের। পরে টমেটো চাষ কীভাবে করতে হয়, তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুইজনই প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে চাষ করে বেশ সফল হন তারা। কীভাবে চারা গাছ রোপন করতে হয়, ক্ষেতে কিভাবে পরিচর্যা করতে হয় কিংবা কখন টমেটো উঠাতে হয় প্রশিক্ষণে এসব শেখানো হয় তাদের। এ ছাড়া জমিতে কি ধরনের সার দিলে ফলন ভালো হয় এসব পদ্ধতিও শেখানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে তারা যখন টমেটো চাষ করতে যান, তখন অর্থ সংকটে পড়েন। প্রথমবার ডিএফইডি থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নেন। কিন্তু সে টাকা দিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা কঠিন ছিল তাদের। পরে ধাপে ধাপে ডাম ফাউন্ডেশন থেকে ঋণ নিয়েছেন। এখন ৫০ হাজার টাকার ঋণ চলছে ডাম ফাউন্ডেশনে। টমেটো পাকানোর জন্য কিংবা দীর্ঘদিন রাখার জন্য কখনো খারাপ কিছু মেশান না বলে জানান সামাদ।

হালিমা খাতুন বলেন, আমাদের দারিদ্র্যকে জয় করতে ডাম ফাউন্ডেশন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে ডিএফইডি'র অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, আমরা এই ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করতে চাই।

আবদুস সামাদ বলেন, বাজারে টমেটোর ব্যাপক চাহিদা। ১২ মাসেই টমেটোর চাহিদা থাকে। তাই টমেটোর ব্যবসা করেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। তাছাড়া টমেটো চাষ করলেই তো হয় না; এগুলো ক্ষেত থেকে উঠানো এবং তা বাড়িতে নিয়ে বাজারজাতের প্রক্রিয়া করা এসব কাজই করে হালিমা। ডাম ফাউন্ডেশন থেকে ঋণও নিয়েছে সে। আমি শুধু কিছু শ্রম দেই। দুই জনের পরিশ্রমের সমন্বয়ে আমরা আজ দারিদ্র্যকে জয় করে স্বাবলম্বী হয়েছি।

তবে টমেটো চাষ সম্প্রসারণে সামনে কিছু বাধাও রয়েছে তাদের সামনে। প্রথমেই বড় আকারে জমির প্রয়োজন। এরপর জমি পেলেই তো হবে না; বড় আকারের ঋণের প্রয়োজন। ঋণ এবং জমি নিশ্চিত করতে পারলে আগামী বছর আরো বড় আকারে টমেটো চাষ করার স্বপ্ন আছে এই দম্পতির। তবে শঙ্কা আছে ঝড়-বৃষ্টির। তবে এসব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে যেতে চান অনেক দূরে। টমেটো ব্যবসা দিয়েই সন্তানকে মানুষ করতে চান; এমন স্বপ্ন এখন হালিমা-সামাদ দম্পতির।

সুপারি কুচি করে লাখোপতি কেশবপুরের পার্বতী

প্রকাশকাল: ৬ মার্চ, ২০১৬, নয়া দিগন্ত

শফিকুল ইসলাম, স্টাফ রিপোর্টার, কেশবপুর (যশোর) থেকে ফিরে

যশোরের কেশবপুর থানা সদর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরত্বে খতিয়াখালি গ্রাম। এখানকার গৃহবধু পার্বতী দাস। একসময় অর্থ আর কাজের অভাবে ঠিকমতো যার সংসার চলতোনা। দুই সন্তানের পড়ালেখার টাকা সময়মতো যোগাতেও কষ্ট হতো। বর্ষা মৌসুমে জমিতে হতোনা কোনো ফসল। ফলে বসে বসে অলস সময় কাটত। স্থানীয়দের কাছে সাহায্যও পাওয়া যেত না। কিন্তু তাদের সেদিন আর নেই। এখন সংসারে এসেছে স্বচ্ছলতা। কর্মের কারণে

পার্বতী দাস তার সহযোগীদের নিয়ে সুপারি কুচিতে ব্যস্ত

নিজেই নিজের পরিবারে সফলতা এনেছেন। বর্তমানে এক হাজার টাকার বিনিয়োগ এসে দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ টাকায়। হ্যাঁ এটা কোনো গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। পরিশ্রম যে সৌভাগ্যের প্রসূতি তার উদাহরণ যশোরের কেশবপুর উপজেলার খতিয়াখালি গ্রামের গৃহবধু পার্বতী দাস। এখন বাজার থেকে এবং মহাজনদের কাছ থেকে সুপারি কিনে তা কুচি (ছোট টুকরা করে খাবার উপযোগী) করে ফের বাজারজাত করছেন তিনি। এতে গ্রামের বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে পুরো গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষ সুপারি কুচির কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন। খতিয়াখালি যেন এখন 'সুপারি কুচি' গ্রাম হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি কেশবপুরের এই গ্রামে গিয়ে চোখে পড়ে সুপারি কুচি করার দৃশ্য।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনের অভাব আর না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা খতিয়াখালি গ্রামকে চিহ্নিত করেছিল অভাবি অঞ্চল হিসেবে। বর্ষাকালে অথৈ পানি আর শুষ্ক মৌসুমে অন্যের কাছ থেকে ধার-দেনা করে দিন কাটত। তবে এখন তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুক্তার দানার মতো সুপারি ঘুরিয়ে দিয়েছে তাদের ভাগ্যের চাকা।

সরেজমিন গিয়ে জানা গেল, স্বামীর অভাবী সংসারে খতিয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা রপন দাসের স্ত্রী পার্বতী দাসের সংসার চালানো প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। চারজনের সংসারে অভাব দেখা দেয়ায় অন্যের বাড়িতে সুপারি কাটার কাজ

শুরু করেন পার্বতী। বিনা পারিশ্রমিকে শিখেছেন সুপারি কাটার কৌশল। কিন্তু যথেষ্ট পুঁজির অভাবে নিজে কাজ শুরু করতে পারছিলেন না তিনি। তারপরও এক হাজার পঞ্চাশ টাকা নিজস্ব সঞ্চয় দিয়ে তা শুরু করেন।

এমন সময় তার সহযোগী হয় ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)। ২০১৩ সালে ডিএফইডি'র 'মেঘলা' দলের সভানেত্রী শিউলি দাসীর পরামর্শে সমিতিতে ভর্তি হয়ে সঞ্চয় জমাতে শুরু করেন পার্বতী। একমাস পর ডিএফইডি থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মা, মেয়ে মিলে সুপারি কুচি করার উদ্যোগ নেন। যশোর থেকে বড় যাঁতি (শর্তা) কিনে আনেন। এরপর কিছু কাঁচা সুপারি কিনে আনুষ্ঠানিকভাবে সুপারি কুচি করার কাজ শুরু করেন ছোট পরিসরে। বাড়তে থাকে তার কাজের পরিধি। পরের বছর সমিতি থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নেন এবং লাভের টাকা দিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার আরো ১০টি যাঁতি ও সুপারি কিনেন। চলতে থাকে সুপারি কুচি করার কাজ। সেই থেকে আর থেমে থাকেনি পার্বতীর সুপারি কুচি ব্যবসা। এখন তার বাড়িতে সুপারি কুচির জন্য ১০৫ জন নারী-পুরুষ দৈনিক কাজ করেন।

পাবর্তীর ব্যবসা মূলত পরিচালনা করেন স্বামী রপন দাস। তিনি বলেন, বিভিন্ন আকারের কুচি সুপারি তৈরি করতে ভাল মানের সুপারি প্রয়োজন হয়। প্রতিদিনই কাঁচা, শুকনা এবং মজা (ভেজানো) সুপারি কিনে তা বাছাই এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ করি। এরপর শ্রমিকদের মাঝে পাঁচ ও দশ কেজি হিসেবে দেই কুচি করার জন্য। এভাবে দৈনিক গড়ে ২০০ কেজি সুপারি কুচি ২২০ টাকা থেকে ২৪০ টাকা দরে বিক্রি করি। প্রতি কেজি সুপারি কুচি বাবদ ১০ টাকা দেয়া লাগে। সব খরচ বাদে বর্তমানে দৈনিক আয় এক হাজার টাকা। যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, মাগুরা, নড়াইল, ফরিদপুর, ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই সুপারি বিক্রি হয়। সুপারির খোসাগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যা বিক্রি করে টাকাও পাওয়া যায়।

সাফল্যের কথা তুলে ধরে পার্বতী দাস বলেন, এই ব্যবসা করে তিনি ৯৮ হাজার টাকা দিয়ে স্বামীর জন্য ফ্রিডম মটর সাইকেল, দেড় লাখ টাকায় ৪ কাঠা জমি, চারটি গরু কিনেছেন এবং ৫ লাখ টাকার দেনা পরিশোধ করেছেন। ছেলেমেয়েকে পড়ালেখা শিখাচ্ছেন। সবমিলিয়ে এখন তার বারোলাখ টাকা পুঁজি। যার পুরোটাই ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। সবমিলিয়ে পার্বতী দাস একজন সফল উদ্যোক্তা। তবে আরো বেশি অর্থ হলে তিনি ব্যবসা বড় এবং আরো বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবেন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা চান তিনি।

খতিয়াখালী গ্রামের আরেক গৃহবধু রীনা রায়। তিনি সুপারি কুচি করে অর্থ সঞ্চয় করেন। এই কাজের সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সুপারি কুচি তৈরির কাজ না থাকলে যে কীভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতাম তা বোঝানো কঠিন। আগে নিজের সংসারের কাজকর্ম সেরে ঘরে বসে অলস সময় পার করতাম। কিন্তু এখন অলস সময় নেই। সুপারি কুচি করে টাকা আয় করছি।

তিনি বলেন, দুই বছর ধরে সুপারি কুচি করার সাথে জড়িত। প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে পনের কেজি সুপারি কুচি করেন তিনি। বিনিময়ে প্রতিকেজি সুপারি কুচি বাবদ ১০ টাকা পেয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি কেশবপুর ইসলামী ব্যাংকে মাসে ৫০০ টাকা হারে ডিপিএস করছেন। এখন পর্যন্ত তার ৫ হাজার টাকা জমা হয়েছে। স্কুল পড়ুয়া মেয়ে বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে তার সাথে কাজে যোগ দেয়। আরও কয়েকজন কর্মী একই ভাষায় তাদের মত তুলে ধরেন।

ডিএফইডি কেশবপুর শাখার ব্যবস্থাপক মো. মফিজুল ইসলাম জানান, পার্বতীর সুপারি কুচি তৈরির কাজ গ্রামের মানুষের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। তার এই কাজ বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। আমাদের সমাজে পার্বতীর মত আরো মানুষ দরকার। আমরা তার ব্যবসার উন্নতির জন্য অর্থের সহায়তা হিসেবে ঋণ দিয়েছি। তিনি নিয়মিতভাবে কিস্তি ও সঞ্চয় দেন। সর্বশেষ তিনি ডিএফইডি থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন।

স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানান, ডিএফইডি'র মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন এসেছে। তারা বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে কাজ করছে। ডিএফইডি'র কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।

বেকারিতে ভাগ্য পরিবর্তন খাদিজার

প্রকাশকাল: এপ্রিল ০২, ২০১৬, দৈনিক ইনকিলাব

হাসান সোহেল, বরগুনা থেকে ফিরে

ব্যবসা করতে মূলধন লাগে না, প্রয়োজন স্বপ্ন ও সাহসের। যখন ব্যবসা শুরু করি তখন সাহস, সততা আর পরিশ্রম করার মানসিকতা ছাড়া আর কোন মূলধনই ছিল না আমার। বলছিলেন বরগুনা জেলা সদরের গিলাতলীর খাদিজা বেগম। তার স্বামী মো. সুমন মৃধা এক সময়ে অন্যের বেকারিতে কাজ করতেন। ঋণে জর্জরিত ছিল পরিবার। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় সিডর সব কিছু শেষ করে দিয়েছিল। দুই সন্তান সাবিনা (৯) এবং তানভির (৭)-কে নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায়

স্বপ্রতিষ্ঠিত ও সুসজ্জিদ বেকারিতে খাদিজা

দিনানিপাত করতেন। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এক সময়ে চিন্তা করলেন স্বামী যেহেতু বেকারির সব ধরনের কাজ পারেন, পাশাপাশি নিজেও এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারবেন। আর তাই ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) থেকে ঋণ নিয়ে ছোট পরিসরে বাড়ির মধ্যেই বেকারি গড়ে তুলেন খাদিজা। ধীরে ধীরে এর প্রসার বাড়াতে থাকেন। বর্তমানে রাস্তার পাশে জমি ক্রয় করে নিজের ৭ শতাংশ জমির উপর 'মেসার্স মুন বেকারি' নামে বড় পরিসরে বেকারির কারখানা তৈরি করেছেন। খাদিজার বেকারির বিস্কুট, কেক, রুটি পুরো বরগুনাতে সাপ্লাই দেয়া হয়। অন্যান্য বেকারির চেয়ে তার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পণ্যের মান ভালো হওয়ায় এলাকায় বেশ সমাদৃত 'মুন বেকারি'। বরগুনার বেতাগী, আয়লাসহ বিভিন্ন স্থানে তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য যায়। বর্তমানে খাদিজা ও তার স্বামী সুমন ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বেকারিতে ১১ জন কর্মচারী কাজ করছে। ৪টি নিজস্ব টম টম ভ্যান বেকারির মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

জানা যায়, বাড়ির মধ্যে ছোট পরিসরে খাদিজার একটি বেকারির ছিল। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর সব ধ্বংস করে দেয়। ঘরসহ কারখানার চুলা সব নষ্ট হয়ে যায়। একেবারে পথে বসে যাওয়া অবস্থায় ডিএফইডি'র ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতায় গৌড়িচন্না ব্রাঞ্চ থেকে ৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছোট পরিসরে আবার ব্যবসা শুরু করেন খাদিজা। আস্তে আস্তে পরিচিতি বৃদ্ধির পাশপাশি ব্যবসারও প্রসার ঘটান তিনি। ২০০৮ সালে ডিএফইডি থেকে ঋণ নিয়ে রাস্তার পাশে কারখানা তৈরি করেন খাদিজা। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৩৫ আইটেমের পণ্য তৈরি করা হচ্ছে কারখানায়। ২৫ হাজার টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয় খাদিজার। অনেক ক্রেতা বাসা-বাড়ির জন্য নিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চায়ের দোকানেই এর চাহিদা বেশি। যারা এই পণ্য সামগ্রী দোকানে দোকানে পৌঁছে দেয় তাদেরকে পৃথক কমিশন দেয়া হয়। এক্ষেত্রে যে যত বেশি বিক্রি করবে তার ততো বেশি কমিশন। কারখানার অধিকাংশ বিস্কুটের প্যাকেট ২৫,৪৫,৫০,৮০ এবং ৯০ টাকা। নিজস্ব চারজন ভ্যানচালক আছেন। বাইরে থেকেও ৪জন ভ্যানচালক পণ্য পরিবহনে কাজ করছে। বর্তমানে খাদিজার এই ব্যবসার মাধ্যমে ২৫টি পরিবার চলছে। এদিকে খাদিজা বেগম বেকারির পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের পাশাপাশি গত ঈদের পর থেকে কারখানার সামনের দিকে একটি মুদি দোকান তৈরি করেছেন। বেকারির পাশাপাশি মুদি দোকান থেকেও ভালো আয় হচ্ছে তার। খাদিজা আরও জানান, বিস্কুট তৈরির আলাদা আরও একটি চুলা তৈরি করেছেন সম্প্রতি। চাহিদার ওপর উৎপাদন বাড়ানো হয়। বেশি প্রয়োজন হলে এই চুলার ব্যবহার করেন।

খাদিজা বেগম বলেন, ভালো লাগছে নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি। নিজেই তত্ত্বাবধান করছি। অন্যের বেকারিতে স্বামী এক সময়ে কাজ করতো। এখন নিজের মতো করে ব্যবসা পরিচালনা করছে এর চেয়ে ভালো লাগার আর কি থাকতে পারে।

তবে ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে সমস্যা নেই তা কিন্তু নয়; রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের মোবাইল কোর্টের সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা বলে উল্লেখ করেন খাদিজা। খাদিজা বেগম বলেন, গ্রাম এলাকা। সবেমাত্র কারখানা তৈরি করেছি। এখনো কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গেই কারখানার কাজ চলছে। তিনি বলেন, মাকড়সার জাল দেখা গেছে বলে আবার কাঁচের আয়না না থাকায় জরিমানার মুখে পড়তে হয়েছে। এ ছাড়া ভ্যাট অফিস থেকে প্রতিদিনই ঝামেলা করে। তিনি বলেন, ১০০ টাকার বিস্কুটে ১৫টাকা ভ্যাট দিতে হয়। সব মিলিয়ে ব্যবসাও এতো হয় না। তারপরও তাদেরকে টাকা না দিলে বিদায় হয় না। অবশ্য জরিমানার টাকার বিনিময়ে তাদেরকে কোন রশিদ দেয়া হয় না বলেও জানান তিনি। গ্রামের মানুষের বিস্কুটের দামে ভ্যাট যুক্ত করলে মানুষ আর বিস্কুট খাবে না। তাই এসব নিয়ে বিপাকে পড়তে হয় বলে উল্লেখ করেন খাদিজা। খাদিজা জানান, ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্যানিটারী দপ্তর থেকে অনুমতি নেয়া হয়েছে। ভ্যাট নিয়েই যত বিপদ। এ ছাড়া বিএসটিআই'র লাইসেন্সের জন্য প্রক্রিয়া চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করেই বেকারির বিস্কুট, কেকসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা হচ্ছে। এলাকার এক বিস্কুট ক্রেতা জানান, অন্যান্য বেকারির চেয়ে মুন বেকারির বিস্কুট ও কেকের মান ভালো এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি হয় বলেই আমরা এখানকার পণ্য বাসায় নেই।

বর্তমান অবস্থানের জন্য ডিএফইডি'র কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে আমি এবং আমার পরিবার অনেক ভালো আছি। এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি আমাদের পরিশ্রম এবং ডাম ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতা। ডাম ফাউন্ডেশনের এই সহায়তা না পেলে এ পর্যন্ত আসা সম্ভব হতো না।

ডিএফইডি'র বরগুনা এরিয়ার সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন বলেন, খাদিজা তাদের সংস্থার সদস্য পদ পান ২০০৮ সালের এপ্রিলে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির ভালো একজন ঋণ গ্রহীতা। সঠিক সময়ে নিয়মিতই ঋণের কিস্তি প্রদান করছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে তার আমানতও অনেক ভালো বলে উল্লেখ করেন। বর্তমানে খাদিজার আমানত ৪০ হাজার টাকার উপরে বলে জানান তিনি। মো. নাসির উদ্দিন বলেন, শুরু থেকেই খাদিজা তার ব্যবসার বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী ছিল। বিষয়টি মাথায় রেখেই তাকে ঋণ দেয়া হয়েছে। সে এখন এলাকায় সফল ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমরাও এক্ষেত্রে সফল।

কাঠের শো-পিস তৈরি করে শাহানা এখন স্বাবলম্বী

প্রকাশকাল: মার্চ ২২, ২০১৬, কালের কণ্ঠ

শফিকুল ইসলাম, স্টাফ রিপোর্টার, কেশবপুর (যশোর) থেকে ফিরে

কেশবপুরের আলতাপোল গ্রাম। থানা শহর থেকে স্বল্প দূরত্বের এলাকাটি অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে মাঠ-ঘাট ডুবে থাকে দীর্ঘ সময়। ফসলও ঠিকমতো হয়না। কাজের অভাবে অলস সময় পার করতে হয় এখানকার বাসিন্দাদের। তবে অলস বসে থাকলে তো আর সংসারে গতি আসেনা। জীবন-জীবিকার তাগিদে তখন ভিন্ন পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েন তারা। এই ভিন্ন পেশা হিসেবে কাঠের শো-পিস তৈরি করে তা বাজারজাত শুরু করেন শাহানা। গাছের চিকন ও স্বল্প মোটা ডাল এবং বডি শুকিয়ে তা মেশিনে প্রক্রিয়া করে দৃষ্টিনন্দন শো-পিস তৈরি করে থাকেন শাহানা।

দৃষ্টিনন্দন কাঠের শো-পিস তৈরিতে ব্যস্ত শাহানা

এই গ্রামের এক গৃহবধু শাহানা বেগম। যিনি সংসারের অভাব দূর করতে প্রায় ১৫ বছর ধরে কাঠের শো-পিস তৈরি করে চলেছেন। স্বামী, এক ছেলে আর দুই মেয়ের সংসারে এনেছেন স্বচ্ছলতা। আখের চাষ, মাছের ঘের আর গরু পালনের পাশাপাশি সেলাই মেশিনও চালান তিনি। স্বামী আব্দুল মালেক ফার্নিচারের রং মিস্ত্রির কাজ করেন। ফলে আগের মতো এখন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না তাকে। শাহানা নিজ হাতেই মেশিনে তৈরি করছেন কাঠের নান্দনিক শো-পিস। বর্তমানে শাহানা ছাড়াও এই গ্রামের বহু মানুষ কাঠের শো-পিস তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করার পাশাপাশি সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন। আলতাপোল গ্রামের মানুষ শো-পিস তৈরি করে নিজেদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি যশোরের কেশবপুরের আলতাপোল গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে এসব দেখা ও জানা যায়। চোখে পড়ে শো-পিস তৈরির কর্মযজ্ঞ।

শাহানা বেগম জানান, নিজেদের দুই বিঘা জমি থাকলেও চাষাবাদ ভালো হতো না। ফলে সংসারে অভাব লেগেই ছিল। প্রায় অর্ধযুগ আগে তিনি ভারতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যান। সেখানে শো-পিস তৈরির কারখানা দেখে উদ্বুদ্ধ হন। জানতে পারেন, কারখানা তৈরি করতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা লাগে। কিন্তু অর্থের অভাবে কারখানা দেয়া হয়নি। তবে মনের ভেতর বাসনা ছিল একদিন তিনি কারখানা দিবেনই। সেই থেকে ২০০৮ সালে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর স্থানীয় 'দোয়েল' মহিলা উন্নয়ন দলের সভাপতি নাছিমা বেগমের পরামর্শে দোয়েল দলে ভর্তি হয়ে সঞ্চয় জমাতে থাকেন। এক মাস পর ডাম ফাউন্ডেশন থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আর ১বিঘা জমি বন্ধক দিয়ে সর্বমোট ২০ হাজার টাকা জোগাড় করে মা ছেলে মিলে শো-পিস তৈরির জন্য কারখানার স্থাপনের উদ্যোগ নেন। যশোর থেকে মেশিন কিনে এনে আনুষাঙ্গিক কাজ শেষের পর কারখানার আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করেন ছোট পরিসরে।

পরের বছর সমিতি থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এবং লাভের টাকা দিয়ে মোট ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আরো ২টি মেশিন কিনেন। বর্তমানে তার কারখানায় মোট ৩টি মেশিনে কাজ হয়। ডিএফইডি'র ঋণ আছে ত্রিশ হাজার টাকা। শাহানা বেগমের শো-পিস তৈরির কারখানায় মগ, জগ, গ্লাস, ডাল ঘুটনী, খুনতি, হামানদিস্তি, এ্যাসট্রে, পাউডার কেস, মসলাদানী, চুরির আলনা, চামচ, ডিম সেট, ডাব সেট, আপেল সেট, টাকা রাখার ব্যাংক, পাতিল, হারিকেন, খেলনা সেট, বেলন পিড়া, ভিআইপি খুনতি, টিফিন বক্স, হাঁড়ি, কড়াই ইত্যাদি তৈরি করা হয়। সবমিলিয়ে প্রায় দুই থেকে তিনশ আইটেম তৈরি করা যায় বলে জানান শাহানা বেগম।

তিনি জানান, বিভিন্ন শো-পিস তৈরিতে আম, জাম, কাঁঠাল, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতি কাঠের প্রয়োজন হয়। এসব কাঠের দামও তুলনামূলকভাবে কম। স্থানীয় ২৩ মাইল এলাকা থেকে কাঠ কিনে তা শুকিয়ে কারখানায় বিভিন্ন ধরনের ও আকারের শো-পিস তৈরি হয় মুহূর্তের মধ্যেই। শো-পিসগুলো আকারভেদে ২০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। এই কাঠের শো-পিস বিপণন হয় যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, মাগুরা, নড়াইল, ফরিদপুর, ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়। শো-পিস তৈরি প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিত্যক্ত কাঠ বের হয়। যা পরবর্তীতে জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এই ব্যবসা করেই শাহানা বেগমের নগদ পুঁজি এখন এক লাখ টাকা। বাড়ির তৈরির জন্য কিনেছেন ১৫ কাঠা জমি ও এঁড়ে গরু।

শাহানার কারখানায় স্থানীয় লতিফের স্ত্রীও শো-পিস তৈরির কাজ করেন। তিনি বলেন, অবসরে অলস সময় কাটাই সেই সময়টুকু কাজ করে কিছু অর্থ পাই, মন্দ কি? শাহানা বেগমের কারখানায় অনেক নারী শ্রমিক কাজ করেন। জানা যায়, বিশ জনের বেশি নারী শ্রমিক তার কারখানায় কাজ করেন। একটি শো-পিস তৈরি করতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে প্রতিটি শো-পিসের জন্য ২-১০ টাকা দেয়া হয়। একজন নারী শ্রমিক গড়ে প্রতিমাসে ১ থেকে ২ হাজার টাকা পান।

কাজের সার্বিক বিষয়ে শাহানা বলেন, আমি যে পেশায় নিয়োজিত তা নিয়ে আমি গর্বিত। স্বল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও বর্তমানে ব্যবসার পরিধি বাড়াতে চাই। এ জন্য আরো আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমানে সব খরচ বাদে মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা লাভ হয়। এখন নিজের পাকা বাড়ি ও মালামাল পরিবহনে নিজস্ব গাড়ির স্বপ্ন দেখছেন তিনি। কিন্তু বিদ্যুতের লোডশেডিং এবং আর্থিক স্বল্প পুঁজি বড় বাধা বলে তিনি মনে করছেন।

ডিএফইডি'র কেশবপুর শাখার ম্যানেজার মো. মফিজুল ইসলাম জানান, শাহানা বেগম আমাদের পুরনো সদস্য। তিনি নিয়মিতভাবে সঞ্চয় জমা করেন এবং ঋণের লেনদেন করে থাকেন। তিনি খুবই পরিশ্রমী। তার শো-পিস তৈরির কারখানা দেখে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে স্থানীয়ভাবে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। তার পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে শো-পিচ তৈরি করে সংসারের অভাব দূর করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। ডিএফইডি শাহানা বেগম এবং অন্যান্য দারিদ্র্য মানুষের সহায়তায় পাশে থাকবে বলে তিনি জানান।

সালেহার স্বাচ্ছন্দ্যের সংসারের বাহক মুরগীর খামার

প্রকাশকাল: মে ০৫, ২০১৬, The Bangladesh Today

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর (কালিয়াকৈর) থেকে ফিরে

না ভাই, আমরা ভালো আছি। আর এমন করে বাকী জীবনটাও পার করে দিতে চাই। তবে সন্তানেরা আরও ভালো থাকবে এটাতো চাই-ই। বলছিলেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের অন্তর্গত রাখালিয়া চালা গ্রামের সালেহা খাতুন। সাথে থাকা স্বামী পান্নু চৌধুরী তার সাথে কিছুটা সুর মেলালেন।

খামারে মুরগীর খাবার বিতরণ করছেন সালেহা ও তার স্বামী

দুজন মিলেই গড়ে তুলেছি মুরগীর খামার। বাধা-বিপত্তি ছিল। এখনো আছে, তবে কম। কাজ করতে গেলেতো কিছু বাধা থাকবেই। ছোটো খাটো কিছু এরকম সমস্যা ছাড়া আমরা রোজগারের এই কাজকে ভালোভাবেই নিয়েছি। সামনের দিনগুলো এমনভাবে চলে গেলেই খুশি। প্রকৃতির শীতল ছায়ায় তারা জীবনটাকে আপন করে নিয়েছে। সংসারে অভাব নেই। তবে নেই কোনো উচ্চ বিলাসী জীবনের প্রত্যাশাও। চার সন্তানের এই দম্পতির জীবন চলাও তাই সহজ-সরল।

সালেহারা নয় বছর আগে পিতৃভূমি মানিকগঞ্জ থেকে স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে এখানে চলে আসে। স্থাবর সম্পত্তি বলতে যা কিছু ছিল সব বিক্রি করতে হয়েছিল তখন। নগদ কিছু টাকা ছাড়া আর কিছুই তেমন ছিলনা। সালেহা ও তার স্বামী রাখালিয়া চালায় ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করে।

তবে নয় বছর আগের জীবন আর বর্তমান জীবন এক নয়। সেদিনের প্রতিষ্ঠা করা মুরগীর ফার্ম আজ অনেক বড় হয়েছে। অল্প পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিলেন। তখনকার দুই রুমের একটি টিনের বাড়ির পাশেই একটি খাঁচায় ২৫০টি মুরগীর বাচ্চা দিয়ে তারা শুরু করেছিল। আজ সেখানে দুটি বড় খাঁচায় ২৫০০টি মুরগীর বাচ্চা পালন করা হয়।

বাড়ির আঙ্গিনা নেই। লম্বাটে বাড়ির মাঝখানে থাকার জন্য কয়েকটি ঘর। আর দু'প্রান্তে আলাদা দুটি জায়গায় পালন করা হচ্ছে দুই জাতের মুরগী। একপ্রান্তে ব্রাউন কক আর অন্য প্রান্তে ছেচু কক।

সালেহা জানালেন, তারা একসাথে ১০০০টি ব্রাউন ককের বাচ্চা ওঠায়। ১ দিন বয়স থেকে তারা লালন পালন করতে থাকেন। দুইমাস পরে প্রতি বাচ্চার ওজন হয় প্রায় ৭০০ গ্রাম। আর দুই মাস হলে তারা বিক্রি করে দেন।

সালেহার স্বামী পান্নু চৌধুরী বললেন, এই দুই মাসে এই ১০০০ বাচ্চার জন্য ৩৫ বস্তা খাবার লাগে। যার প্রতি বস্তার মূল্য ২১০০ টাকা। অন্যদিকে ঔষধ লাগে ১০০০০ টাকার।

অন্যদিকে ছেচু কক ৪৫ দিনেই ৭০০ থেকে ৭৫০ কিলোগ্রাম হয়ে যায়। খাবারে স্বাদ প্রায় ব্রাউন ককের মতো একই রকম লাগে। আর এখানেও ১০০০০ টাকার ঔষধ লাগে। খরচ বলতে এটাই। দেড় মাস ও দুই মাস পরপর মুরগীর নতুন চালানের ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে বেশ গোনার মতো একটি ব্যবধান থেকে যায়। যা দিয়ে সংসার স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চালিয়ে নিতে পারেন সালেহা দম্পতি।

কথা প্রসঙ্গে সালেহা জানালেন, একবার সব মুরগীই একসাথে মারা গেল। তাই খুব সতর্ক থাকতে হয়। নিয়মিত ঔষধের ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষ কারণে রোগে আক্রান্ত হলে বিশেষ ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সুতরাং খাদ্যের সুব্যবস্থার পাশাপাশি রোগবালাই নিয়ে ভাবনাটা আরও বেশি।

স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শ নেন কিনা জানতে চাওয়া হলে জানান, নিজেরা প্রথমে ব্যবস্থা নিই। পরে যদি আমাদের নিয়মিত ঔষধে কাজ না হয়, তাহলে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়।

নয় বছর আগে শুরু হলেও আজকের এই অবস্থানে আসতে তাকে অনেকের সহযোগিতা নিতে হয়েছে। ২০১০ সালে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর রাখালিয়া চালা মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য হন সালেহা। সেখান থেকে প্রথম কিস্তিতে ২০০০০ টাকা তুলেন। পরবর্তীতে ৩০০০০ ও ৬০০০০ টাকা করে ধাপে ধাপে ঋণ গ্রহণ করেন। যেহেতু অল্প কিস্তিতে পরিশোধ করতে হতো, তাই সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। এদিকে এই ঋণের অর্থ দিয়ে তারা তাদের অবস্থানটাকেও সমৃদ্ধ করতে পেরেছে।

অন্যদিকে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট-এর ঢাকার এরিয়া ম্যানেজার বাঁধন কুমার বিশ্বাস জানালেন, তারা যদি এই অবস্থা থেকে আরও পরিবর্তন চান, কর্মকাণ্ডকে আরো বিস্তৃত করতে চান, তাহলে তারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং ডিএফইডি সবসময় তাদের পাশে আছে।

হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষ;
সাফল্যের নজির গড়েছেন বরগুনার নুপুর

প্রকাশকাল: মার্চ ৩১, ২০১৬, দৈনিক ইনকিলাব

হাসান সোহেল, স্টাফ রিপোর্টার, বরগুনা থেকে ফিরে

বরগুনা জেলা সদরের হেউলিবুনিয়া গ্রামের এক গৃহবধু নারগিস আক্তার নুপুর। গ্রামে হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষ করে সাফল্যের নজির গড়েছেন তিনি। নিজের অবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ করে দিয়েছেন এলাকার অনেকের। এসএসসি পাশ করার পর পরই মা-বাবা বিয়ে দিয়েছেন। তার স্বামীর নাম হারিছ মৃধা। রায়হান (৪) নামে তাদের একটি সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর প্রথম দিকে অবস্থা বেগতিক ছিল। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর এলাকার অন্যান্যদের মতো তাদেরও সবকিছু শেষ করে দেয়। মাছের ঘের থেকে শুরু করে সবকিছু নষ্ট করে দেয় সিডর,

ঘেরে হাঁসের দেখাশোনা করছেন নুপুর

জানান নুপুর। একই সঙ্গে মাছেরও দাম কমে যায়। পরিবারের পথে বসার উপক্রম হয়। সবকিছু হারিয়ে বিপাকে পড়েন নুপুর। পরবর্তীতে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।

প্রথম ২টি ঘেরে মাছ চাষ ও ঘেরের উপরে হাঁস-মুরগির খামার দিয়ে শুরু হয় তার ব্যবসা। পরে ৪টি এবং নতুন করে আরও একটি পুকুরে মাছের ঘের করেছেন। পাশাপাশি ঘেরে হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। তার খামারে হাঁস ২০০টি। কয়েকদিন আগেও ৭০০টি ছিল। সম্প্রতি বিক্রি করেছেন। ব্রয়লার মুরগি আছে ৪০০টি। একই সঙ্গে মাছের ঘের ৫টি। এর মধ্যে সম্প্রতি একটি ঘেরের মাছ বিক্রি করেছেন। এখন আরও গভীরতার জন্য মাটি কাটছেন। মাছ,

হাঁস-মুরগির খামারের পাশপাশি ঘেরের পাশে কলা, নারকেল, লাউ, মিস্টি কুমড়া, বেগুন, বরবটি, সিম ইত্যাদি কৃষি পণ্য চাষ করছেন। পরিবারের চাহিদা পূরণ করে এসব পণ্য থেকেও ভালো আয় করছেন নুপুর।

তিনি বলেন, মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা নিলে মাসে শতকরা ১০টাকা সুদ দিতে হয়। ডাম ফাউন্ডেশন থেকে কম সুদে ঋণ নিয়ে আস্তে আস্তে পরিশোধ করি। এমনকি সপ্তাহে সপ্তাহে হাঁস-মুরগি, ডিম ও মাছ বিক্রি করে ঋণের টাকা পরিশোধ করছি। ডিএফইডি থেকে সর্বশেষ ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন এ বছরের জানুযারি মাসে। এর আগে প্রয়োজনমত প্রতিবছর ৫০ হাজার, ৩০ হাজার টাকা করে ঋণ নিয়েছেন ডিএফইডি থেকে। নুপুর বলেন, বর্তমানে তিনি ১২০ শতাংশ জমির ওপর গড়ে তুলেছেন হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার। প্রথম বছরে মাছ ও হাঁস-মুরগি বিক্রি করে লাভ পেয়ে বাড়াতে থাকেন খামার ও ঘেরের পরিধি। এখন ৪টি পুকুরে চাষ হচ্ছে ভিয়েতনামী কৈ, তেলাপিয়া, রুই, কাতল ও পাঙ্গাশ মাছ। ১টিতে মাগুর মাছের চাষ করছেন। এ ছাড়া আরও একটি মাছের ঘের বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে।

নারগিস আক্তার নুপুর জানান, এখন অনেক ভালো আছেন। পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরেছে। নিজে এবং পরিবারকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলে এলাকার মধ্যমনি হয়ে উঠেছেন। এলাকার সবাই এবারই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী সদস্য হিসেবে নির্বাচন করার জন্যও বলেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান পদে একজন নিকটাত্মীয় নির্বাচন করায় তিনি এবার নির্বাচন করেননি। তিনি জানান, অন্যদের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম বলে এলাকার সবাই তাকে অনেক পছন্দ করে। এদিকে নুপুর শুধু নিজেই স্বাবলম্বী হচ্ছেন; তা নয়। নিজের সফলতার বিষয় এবং এভাবে যে অন্যরাও স্বাবলম্বী হতে পারে সে বিষয়ে এলাকার সবাইকে বলছেন নুপুর। তারই অনুপ্রেরণায় এলাকায় প্রায় ১০০টি ঘের তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়। নারগিস আক্তার নুপুর বলেন, ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর উপজেলা মৎস্য অফিস থেকে মাছের পোনা এবং খাবার দেয়া হয়েছিল। ওই সময়ে মৎস্য অফিস থেকে ৩ বার মাছের খাবার পান তিনি। তিনি বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে মাছ, হাঁস-মুরগরি অসুখ হলে সহায়তা পেলে আরো উপকৃত হতেন।

ব্যবসায় ভালো করলেও কিছু সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেন নুপুর। তিনি জানান, মাছ ও হাঁস-মুরগির খাবারের দাম কম হলে খামার করে আরো বেশি আয় করা সম্ভব। তিনি জানান, আগের দিনে মাছ চাষ করে যে কেউ অনেক বেশি লাভবান হতেন। অথচ এখন আর কিছুতেই সেটা সম্ভব নয়। আগের তুলনায় লাভ নেমে এসেছে অর্ধেকে। সবকিছুর দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে কয়েকগুন। নুপুর জানান, মাছের খাবারের দাম বেশি অথচ সে হারে বাজারে মাছের দাম পাওয়া যাচ্ছে না। একই সঙ্গে পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। বরগুনা থেকে এক বস্তা খাবার আনতে খরচ পড়ে ২৫শ' টাকা। এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগও মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মাছ ও হাঁস-মুরগির খামাড় নিয়ে পরামর্শ নিতে প্রতিদিনই কেউ না কেউ তার কাছে আসেন, তিনি তাদেরকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়াও নুপুর যখন কোনো বিষয়ে সমস্যায় পড়েন তখন দ্রুত উপজেলা মৎস্য অফিসে গিয়ে মৎস্য কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করেন।

বর্তমান সফলতার বিষয়ে নুপুর বলেন, ব্যবসা করতে মূলধন লাগে না, স্বপ্ন ও সাহস লাগে। আমিই এর বড় প্রমাণ। যখন ব্যবসা শুরু করি তখন সাহস, সততা আর পরিশ্রম করার মানসিকতা ছাড়া আর কোন মূলধনই ছিল না আমার।

বর্তমান অবস্থানের জন্য ডিএফইডি'র কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে আমি এবং আমার পরিবার অনেক ভালো আছি। এর পেছনে মূল চালিকাশক্তি আমাদের পরিশ্রম এবং ডিএফইডি'র সহযোগিতা। ডিএফইডি'র সহায়তা না পেলে এ পর্যন্ত আসা সম্ভব হতো না। ডিএফইডি'র মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচির বরগুনা জেলার সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন জানান, নুপুর শুরু থেকেই তার ব্যবসার বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী ছিল। বিষয়টি মাথায় রেখেই তাকে ঋণ দেয়া হয়েছে। সে এখন এলাকার সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমরাও এক্ষেত্রে সফল।

শুঁটকিতে মজিদার সাফল্য

প্রকাশকাল: মে ০৮, ২০১৬, আলোকিত বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর (শ্রীপুর) থেকে ফিরে

পাঁকা বাড়ি দিয়েছি। এখন আর সংসারে অভাব নেই। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ দিলে বাকী জীবনটাও সুখে শান্তিতে কাটাতে চাই। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বড়মি ইউনিয়নের দুর্লধপুর বেপারী পাড়ার মজিদা খাতুন এভাবেই বলে যাচ্ছিলেন তার বর্তমান জীবনের অবস্থা।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে তার স্বামী ইদ্রিস আলী একজনের কাছ থেকে চ্যাপা শুঁটকি তৈরির পদ্ধতি শিখে সামান্য কিছু অর্থ দিয়েই শুঁটকির ব্যবসা শুরু করেন। তা দিয়ে কোনোরকম সংসারটা চলে যেত। এরপর সংসারে আসতে

মজিদা তার ছেলে দু'জনে প্রক্রিয়াজাতকৃত চ্যাপা শুঁটকি যাচাই করছেন

থাকে নতুন মুখ। একে একে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। চাহিদা বাড়তে থাকে। প্রতিমাসে নিয়মিত একটি উপার্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন ইদ্রিস আলী। ব্যবসার পাশাপাশি গ্রামের চৌকিদার পদে চাকরি নিতে হয় তাকে। দুইভাবে উপার্জিত সেই অর্থ দিয়ে বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। দুই ছেলেকে মানুষ করেছেন। বড় ছেলে পুলিশে চাকরিরত। কিন্তু চার ছেলে মেয়ের সংসারে ঐ নিয়মিত উপার্জন দিয়েও স্বাভাবিকভাবে চলছিল না। তাছাড়া শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে ছোট্ট পরিসরের এই ব্যবসাটিও আর চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই ব্যবসা ছেড়ে দিতে হলো তাকে।

কিন্তু সংসারের চাকা সচল রাখতে মজিদা নিজেই তার ছোটো ছেলেকে নিয়ে শুরু করে দেন চ্যাপা শুঁটকির ব্যবসা। নতুন করে ব্যবসা চালু ও সম্পসারণের জন্য এগিয়ে আসে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)। এ জন্য সে ডিএফইডি'র কাছে কৃতজ্ঞ।

মজিদা জানায়, বছরের একবারই অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে এ পুঁটি মাছ ফরিদপুর থেকে আনা হয়। শুঁটকি বানিয়ে সারা বছর বিক্রি করা হয়। তাই বলতে গেলে পুঁজির পরিমাণ বেশিই লাগে। কারণ সারাবছর তো এ শুঁটকি মাছ পাওয়া যায়না বা তৈরি করা যায় না।

পুঁটি মাছ আনার পর প্রথমেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য খাঁচার মধ্যে নিয়ে ভালোভাবে ধোঁয়া হয় এবং পানি ঝরানোর জন্য এক সাথে স্তুপ করে রাখা হয়। প্রায় ১২ ঘণ্টার মধ্যে এ পানি নিষ্কাশন শেষে শুঁটকি প্রক্রিয়া করার কাজ করা হয়। এ জন্য অনেকগুলো মাটির মটকি পরিস্কার করে রাখা হয়। চ্যাপা শুঁটকি তৈরিতে কোনো প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে এবং প্রাকৃতিক মাছের তৈল দিয়েই বেশিরভাগ প্রক্রিয়াকরণ হয়ে থাকে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাছের তেল দিয়ে মটকিগুলোর ভিতরে প্রলেপ দেয়া হয়। এরপর মাটি গর্ত করে মাটির মধ্যে মটকিগুলো ভাঁজে ভাঁজে রাখা হয় এবং মাটি চাপা দেয়া হয়। শুধুমাত্র মুখ উপরিভাগে থাকে। যাতে করে মাছ শুঁটকিতে প্রক্রিয়াজাত করা যায়। এরপর পানি ঝরানো চ্যাপা মাছগুলো ভাঁজে মটকিতে রাখা হয়। মটকি ভরে গেলে মাছের তেল দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মটকির মুখের উপরিভাগে মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। এ প্রক্রিয়াজাত করার জন্য স্থানীয় কিছু লেবার নিয়মিত কাজ করে থাকে। তারা সাধারণত রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টার মধ্যে এ প্রক্রিয়ার কাজ শেষ করে। এরপর মটকিগুলো মাটি থেকে উত্তোলন করা হয়। মাটিতে মটকিগুলো রাখার কারণ হচ্ছে, মটকির মুখে অত্যাধিক চাপ প্রয়োগ করে মুখ বন্ধ করে দেয়া। তা না হলে মটকি ভেঙ্গে যায় এবং মাছ নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় এক মাস রাখার পর মাছ শুঁটকিতে পরিণত হয় এবং ব্যবহার উপযোগী হয়। যতদিন যায় শুঁটকির গুণগত মান তত বৃদ্ধি পায়। সর্বোচ্চ দু'বছর এ প্রক্রিয়ায় রাখা যায়।

মজিদা খাতুন এ চ্যাপা শুটকির পাশাপাশি ইলিশ মাছের শুঁটকিও তৈরি করেন। ইলিশ মাছের প্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ। প্রথমে মাছের আইশ ফেলে কেটে লবণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

এ ব্যবসা সম্পর্কে জানতে চাইলে তার ছোট ছেলে সবুজ মিয়া বলেন, সর্বশেষ (গত বছর) ৪৯ বস্তা মাছ মাছ ক্রয় তিনি করেন। প্রতি বস্তায় প্রায় ৪০-৪২ কেজি মাছ ছিল। এ মাছ শুটকিতে প্রক্রিয়াজাত করতে প্রায় ৭৩টি মটকি ব্যবহার করেছেন এবং এ কাজে বছরে তিনি প্রায় ১০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন।

প্রতিবস্তায় গড়ে ৪২ কেজি হিসেবে ৪৯ বস্তায় প্রায় ৫১ মন পুঁটি মাছ ক্রয় করতে হয়। প্রক্রিয়াজাত করতে পানিসহ অন্যান্য কিছু প্রাকৃতিক পদার্থ ব্যবহার করায় প্রতি মনে ৫ কেজি শুঁটকি বৃদ্ধি পায়। সে হিসেবে ২৫৫ কেজি/৬.৩ মন বৃদ্ধি পেয়ে মোট শুঁটকি পাওয়া যায় ৫৭ মন। প্রতিকেজির পাইকারি বিক্রয়মূল্য ৬০০-৬৫০ টাকা। খুচরা বিক্রয় মূল্য ৭০০ টাকা। সবুজ মিয়া নিজেই বাজারে বিক্রি করে থাকেন বিধায় লাভের পরিমাণ বেশিই হয়ে থাকে। প্রতিমন বিক্রয় মূল্য ২৮,০০০ টাকা ধরে মোট বিক্রয় মূল্য ১৫,৯৬,০০০ টাকা (পনের লক্ষ ৯৬ হাজার) টাকা। ১০ লাখ টাকা খরচ করে বছরে প্রায় ৬ লাখ টাকা আয় হয় প্রতিবছর। মজিদা তার ব্যবসাকে আরো অনেক দূর নিয়ে যেতে চান।

মজিদা খাতুন তাঁর আজকের অবস্থানে বেশ সন্তুষ্ট। তিনি জানান, শুধু তিনি একা নন, তার মতো আরও অনেকের পাশেই দাঁড়িয়েছে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। সংস্থাটির মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি অনেককেই নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। এখান থেকে ঋণ নিয়ে কেউবা তার মতো মজিদা খাতুন হয়ে উঠেছেন, কেউ নিজের ব্যবসা বড় করছেন, কেউ দোকান নিয়ে বসেছেন, আবার কেউ কৃষি কাজে সফলতা পেয়েছেন। নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনের পাশাপাশি করেছেন অন্যের কর্মসংস্থান।

জীবিকায়নের চিত্র

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান

ডিএফইডি
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট

আমাদের কার্যক্রম সমূহ

ঋণ কার্যক্রম

- গ্রামীণ ও নগর ক্ষুদ্রঋণ
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ
- বিশেষায়িত কৃষি ঋণ
- অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ
- ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স
- WASH

সঞ্চয় কার্যক্রম

- সাধারণ সঞ্চয়
- মেয়াদী সঞ্চয়
- বিশেষ সঞ্চয়

প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম

- সমৃদ্ধি
- রোজগার
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন
- WEA
- সমষ্টি
- Value Chain porject
- SIEP
- WIA

এজেন্ট ব্যাংকিং

- বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হিসাব খোলা
- নগদ জমা গ্রহন ও প্রদান
- বৈদেশিক রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান
- ফান্ড ট্রান্সফার
- ব্যালেন্স অনুসন্ধান
- মিনি স্টেটমেন্ট ইস্যু
- ডিপিএস সেবা প্রদান

ডিএফইডি ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি)

সুবিধাসমূহ

- মনোরম পরিবেশ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ ভেন্যু
- মাল্টিমিডিয়া, ওয়াই-ফাইসহ সবধরণের আধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা
- এসি ও নন-এসি আবাসিক সুবিধা
- মানসম্মত ডাইনিং সুবিধা
- বিনোদনের সুব্যবস্থা
- বিভিন্ন ট্রেডে অভিজ্ঞ রিসোর্স পার্সন
- সকল ধরণের IT Facility and Support
- পরিবহন সুবিধা
- এছাড়াও রয়েছে Group 4-এর তত্ত্বাবধানে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রধান কার্যালয়
ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)
বাড়ি # ৮৫২, রোড # ১৩, আদাবর
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল: ০১৮১১-৪৮০০০৬,০১৮১১-৪৮০০১১
ই-মেইল: dfed@ahsaniamission.org.bd

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট
বাড়ি # ৮৫২, রোড # ১৩, আদাবর
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল: ০১৮১১-৪৮০০০৬, ০১৮১১-৪৮০০১১
ই-মেইল: dfed@ahsaniamission.org.bd